অবনীন্দ্রনাথের দ্বারকানাথ চর্চা

শুভজিৎ সরকার

বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র "জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলাদেশের এক অতুলনীয় বংশ-যার জ্যোতিষ্কালোকের পূর্ণোদয় হয়-এক নয়, দুই নয়, তিন পুরুষে। এই বংশের প্রভাতালোকে ছিলেন দ্বারকানাথ, পূর্বাহ্ণে দেবেন্দ্রনাথ ও মধ্যাহ্নে 'রবীন্দ্রনাথ।" [১] অথচ বিস্ময়ের বিষয় ঠাকুর বাড়ির প্রভাতী সূর্য, ভোরের পাখি যাঁর একক হিরণ্ময় প্রচেষ্টায় 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি 'চালাঘর' থেকে প্রাসাদোপোম বাড়িতে উত্তীর্ণ হয়েছিল সেই দ্বারকানাথ রইলেন' বিস্মৃত পথিকৃৎ' রূপেই। দ্বারকানাথের জীবনীকারের তাই বিস্ময় -"এই বিস্মৃতপ্রায় লোকটি কি তবে কুলে কালি দিয়েছিলেন বলে পরিবারের কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করে না? যে -লোকটি তাঁর জীবিতকালে এত লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হল কেন?" [২] অবশ্য এই ক্ষোভ কৃষ্ণ কৃপালনীর একার নয়, দ্বারকানাথের আরেক জীবনীকার ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায়েরও। অমৃতময় নিজের লেখা অপ্রকাশিত দ্বারকানাথের জীবনীর পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন- "দ্বারকানাথ সম্বন্ধে পৌত্রেরা আকৃষ্ট না হলেও প্রপৌত্রদের মধ্যে দেখি অনেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। গগনেন্দ্রনাথের জড়ো করা ঠাকুর পরিবারের চিঠিপত্র, অবনীন্দ্রনাথের লেখা গল্পছবির মাধ্যমে দ্বারকানাথ কে মনে রাখার চেষ্টা হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের মেডেল প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য স্মৃতিচিহ্ন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দিয়ে গেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তো দ্বারকানাথ সংক্রান্ত কয়েক আলমারি নথিপত্র জড়ো করেছিলেন আর তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায় তিনি দ্বারকানাথের কিরকম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।"[৩] দ্বারকানাথের পৌত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতামহ সম্বন্ধে কিছুটা আগ্রহী ছিলেন। নিজের আত্মকথা "আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস" এ তিনি দ্বারকানাথ যে হোটেলে ছিলেন সেখানে যাওয়া, ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে দ্বারকানাথের কথোপকথন ও দ্বারকানাথের সমাধি

বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে দ্বারকানাথ বিষয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন হেমেন্দ্রনাথের পরিবার আর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ-তাঁরা দুইভাই দ্বারকানাথের জীবন সম্বন্ধে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। অমৃতময় তাঁর দ্বারকানাথ চর্চার প্রেরণা হিসেবে দুইজনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন- প্রথমজন তাঁর মাতামহ ক্ষিতীন্দ্রনাথ আর দ্বিতীয়জন দক্ষিণের বারান্দার মহারথী শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অমৃতময় লিখেছেন- "তখনো খবরের কাগজের খরখরে কল্পনার ধাক্কায় তিনি 'অবু দাদু'তে পরিণত হননি, আমাদের তিনি ছিলেন অবন দাদামশাই। তাঁর কাছে অনেক ছোট খাটো ঘটনার গল্প শুনেছি দ্বারকানাথের।"[৪] অবনীন্দ্রনাথের আগে অমৃতময় ' নানা লোকের কাছে নানা গল্প' শুনেছেন দ্বারকানাথের। "কোথায় লক্ষ টাকা দান করেছেন, কেমন কল্পনাতীত আড়ম্বরে ভোজ দিলেন লাট বেলাটদের। ঐসব আশ্চর্য্য গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের কাছে হয়ে গিয়েছিলেন রূপকথার মানুষ।--ব্যতিক্রম ছিলেন দু'জন।"[৫] ক্ষিতীন্দ্রনাথের মতো অবনীন্দ্রনাথ কেন ব্যতিক্রম ছিলেন তার কারণ হিসেবে অমৃতময় লিখেছেন- "তাঁর বলবার কায়দায় মানুষ দ্বারকানাথ কে কতকটা পরিস্কার ভাবেই দেখতে পেতাম।"[৬] অথাৎ কথক অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলার ঢঙে' রূপকথার মানুষ' দ্বারকানাথ অমৃতময়ের কাছে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের চোখে দ্বারকানাথ কেমন ছিলেন তাঁর জানার প্রধান উপকরণ কথক অবনীন্দ্রনাথ, লেখক অবনীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও সংগ্রাহক অবনীন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭১ সালে অথাৎ দ্বারকানাথের প্রয়াণের ২৫ বছর পরে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তিনি কী করে দ্বারকানাথের বিষয়ে এত কথা জানলেন? অবনীন্দ্রনাথ "পুরনো দিনের মানুষের কাছে পুরনো দিনের গল্প শুনতে ভালবাসতেন।"[৭] প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছেই শুনেছিলেন দ্বারকানাথের কথা। যেমন দ্বারকানাথের এক ভাগ্নে দেবেন্দ্রনাথের বাল্য বন্ধু ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়। ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন -"ঈশ্বরবাবু আসতেন, ছেলেবেলায় দ্বারকানাথের আমলের জাহাজের মতো প্রকান্ড একটা কৌচে বসে তাঁর কাছে সন্ধ্যেবেলায় গল্প শুনেছি, সেকালের কর্তাদের।"[৮] আরেকজন হলেন কয়লাহাটার ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা রমানাথ ঠাকুর। পাঁচ নম্বর বাড়ির সাথে তাঁর সম্পর্ক বজায় ছিল। তাঁর দৌহিত্র অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের ভাগ্নি ধীরাবালার। অবনীন্দ্রনাথ রমানাথ

ঠাকুরের পরিবারের মানুষজনের কাছেও দ্বারকানাথের গল্প শুনে ছিলেন বলেই অনুমান। শোনা গল্পের সাথে নিজের কল্পনাশক্তির মিশেল ঘটিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মন্দিরে দ্বারকানাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

"অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন চিত্রশিল্পী, অন্যদিকে তেমনি বিখ্যাত কথা শিল্পী। তুলির রেখায় তিনি রূপ দিয়েছেন কল্পনাকে, কালির রেখায় কাহিনিকে। তাঁর তুলিতে যেমন আছে জাদু, তাঁর লেখায় তেমনি আছে মধু। তুলিতে তিনি জাদুকর, লেখায় তিনি মধুকর।" [৯] কথা শিল্পী ও শব্দ গুরু অবনীন্দ্রনাথের কথাবাড়ির অনন্য দৃষ্টান্ত হল দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়ি যা ছিল পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। পাঁচ নম্বর বাড়ি এখন আর নেই কিন্তু তা বেঁচে আছে অবনীন্দ্রনাথের 'কালির রেখায়।' অবনীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ দ্বারকানাথ কর্তৃক ১৮২৩ সালে নির্মিত এই বাড়ি অবনীন্দ্রনাথের কাছে শুধু ইট,কাঠ, জানালা, দরজা, ছাদ দিয়ে নির্মিত একটা ইমারত ছিল না। সেই বাড়ির ছিল একটি নিজস্ব সত্তা। দ্বারকানাথের পত্নী দিগম্বরী দেবী তাঁর স্বামীর পশ্চিমি বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে খানাপিনা একেবারেই পচ্ছন্দ করতেন না এবং তাঁর স্বামীর সাহেব ম্লেচ্ছসংসর্গের কারণেই স্বামীসেবা ব্যতীত পতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দ্বারকানাথ সহধর্মিনীর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে ইংরেজদের সংবর্ধনার জন্য এই বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করে পৃথক থাকা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বাড়ি গগনেন্দ্রনাথ-সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বাসভবন হয়।অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন- "অদ্ভূত কৌশলে প্রস্তুত করে গেছে ঘরখানা কোন এক সাহেব মিস্ত্রী- সেই নেপোলিয়নের আমলের অনেক আগে"[১০] নির্মাতা সাহেবের বর্ণনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচয় তুলে ধরছেন -"মিস্টার জর্জ এডওয়ার্ড ইভস উপরে, নিচে লেখা গৃহনির্ম্মাণকর্ত্তা।"[১১] 'আরব্য উপন্যাসের এক টুকরোর মতো' দ্বারকানাথের এই তিনতলা বৈঠকখানা বাড়ির নির্মাণ প্রেক্ষিত নিয়ে অবনীন্দ্র উবাচ হল-"কর্তা ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে মান - মর্যাদার ইয়ত্তা ছিলো না কর্তার। সুতরাং খাশ মজলিসের স্থানটা কেমনতরো হওয়া উচিত তা যেন সাহেব মিস্ত্রী বুঝে নিয়েই করেছিলো সূত্রপাত এই তিনতলার ঘরটার। আলো, বাতাস, জাহাজ, ঘর-সমস্ত কে একটা চমৎকার মতলবের মধ্যে সে ঘিরে নিয়ে বানিয়ে গেছে।"[১২] পুরনো দিনের গল্প পিপাসু অবনীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়ির আশেপাশের বাড়ির ছাদে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যারা দ্বারকানাথের মজলিশের সাক্ষী ছিলেন তাদের মুখে সেই

সময়ের এই বাড়ির গল্প শুনেছেন। 'আপনকথা'য় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আপনজন দ্বারকানাথ কর্তৃক নির্মিত শ্রী ও বৈভবের প্রতিমূর্তি বৈঠকখানার বাড়ির হলটার বর্ণনা করেছেন এভাবে- "আর সমস্ত তিনতলাটা দেখাতো যেন মস্ত একটা নৌকা অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘন্টা।"[১৩] প্রাথমিকভাবে চুক্তিভিত্তিক জাহাজে পণ্য সরবরাহ শুরু করলেও পরবর্তীকালে পণ্য পরিবহনের এই মৌলিক শিল্পটিকে ভিত্তি করে দ্বারকানাথ বিপুল বিনিয়োগে একাধিক কোম্পানি গড়ে তোলেন। ১৮৩৩ সালে দেখা যাচ্ছে কমপক্ষে দ্বারকানাথ তিনটি জাহাজের মালিক- ওয়াটার উইচ, মাভিস ও সবচেয়ে বড় ৫১০ টনের জেনোবিয়া। ১৮৩৫ সালে দ্বারকানাথ কেবল ধনী নন, কয়েকটা জাহাজেরও মালিক। তাই বৈঠকখানা বাড়ি জাহাজের আদলে সাজানো হয়েছিল। এই বাড়িতে সাহেবদের সঙ্গে দ্বারকানাথের মজলিশি আড্ডাও বাদ পড়েনি অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায়- "দক্ষিণের চল্লিশফুট ফালিঘরে পড়েছে সাহেবসুবোর জন্যে রাত্রি ভোজের টেবিল অনেকগুলো। টেবিলের উপরে চীনের বাসন থরে থরে সাজানো। সব বাসনেই সোনার জল করা রঙিন ফুলের নক্সা। প্রত্যেক বাসনে কর্তার নামের তিনটে অক্ষরের সোনালি ছাপমারা। ঝকঝক করছে রুপোর সামাদানে মোমবাতি।--উত্তরের দিকে একটা বারান্দা- সেখানে আহারের পর আরামে বসে তামাক খাবার ব্যবস্থা রয়েছে- সেখানটাতে হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো সোনা-রূপোর সটকাতে তামাক সেজে প্রস্তুত, বড়ো সিঁড়ির উপরে চোবদার খাড়া, আসাসোটা হাতে স্থির যেন পুতুল।--জায়গাটা ঝাড়ে, লণ্ঠনে, বাতির আলোয় জমজমাট!--পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরি জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি ভীড় করে দাঁড়িয়ে।"[১৪] বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় অবনীন্দ্রনাথ কত বড় মাপের শব্দের গুরু ছিলেন। তিনি কলম তুলির সাহায্যে যে ছবি এঁকেছেন তা যেকোন চিত্রকরের রং তুলিকে হার মানায়। বোধহয় চিত্রকর যখন তুলি ছেড়ে কলম ধরেন তখন এমনই শব্দ ছবির জন্ম হয়।অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় সেকালের কলকাতার অভিজাত সমাজের জীবনশৈলী ও ঐতিহ্য ধরা পড়ে।অবনীন্দ্রনাথ গর্বিত যে তিনি ঠাকুর বাড়ির মতো এমন এক ঐতিহ্যবাহী নির্মাতার পরবর্তী বংশধর। ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন- "অবনীন্দ্রনাথ কে চিনতে হলে ফিরে যেতে হবে ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ির নির্মাণ ও তার পারিবারিক ব্যবহারের ইতিহাসে। এই বকুলতলার

বাড়িকে না চিনলে অবনীন্দ্রনাথকে চেনা সম্ভব নয়। যে বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার একটা নির্মাণ ইতিহাস আছে। সেই সূত্রপাত ও পশ্চাদপট না জানা থাকলে ' অবীন ঠাকুরের' লেখায় বিশেষত্বটা কী তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো।"[১৫] অবনীন্দ্রনাথ জসীমুদ্দিন কে বলেছিলেন' "লেখার ভিতরে ইঙ্গিত থাকিবে বেশি; সব কথা খুলিয়া বলিবে না; কলম টানিয়া লইবার সংযম শিক্ষা করো।" [১৬]

অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পাঁচ নম্বর বাড়ি প্রকট চরিত্র কিন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর ফাঁকে ফাঁকে এই বাড়ি তার ঐশ্বর্যের ডালি নিয়ে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে।এই স্বল্প পরিসরে তার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব নয় তবে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়ত সম্ভব। "পথে বিপথে" তে তিনি লিখেছেন -" কলকাতায় আমাদের বাসাবাড়িখানা অনেকদিনের। এখন সেটা আমাদের বসতবাড়ি হয়েছে বটে, কিন্ত সেকালে কর্তারা সে বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়ে ছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো; ঝাড়লণ্ঠন, কৌচ-কেদারা, ওয়াটার-পেন্টিং, অয়েল-পেন্টিং, বড়ো বড়ো আয়না এবং সোনার ঝালর দেওয়া মখমলের ভারি ভারি পর্দা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো।" [১৭] পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই বর্ণনা দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়ির সাথে মিলে যায়। ' ফুলবউ' তে যখন উনি লিখছেন- " জলটুঙি, হামাম, কাচমহল, খাসমহল, রাণীমহল এ তো ছিলই, তার উপরে কৌঠার পর কৌঠা, কুঠরির পরে কুঠরি, ঘরের পরে ঘর-"[১৮] তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এই বর্ণনা তো অবনীন্দ্রনাথের স্বচক্ষে দেখা পাঁচ নম্বর বাড়ির প্রতীকী রূপের বর্ণনা যা আমরা " জোড়াসাঁকোর ধারে" তে পাই।"জোড়াসাঁকোর ধারে" তে অবনীন্দ্রনাথ অন্দরমহল ও বারমহলের বর্ণনা প্রসঙ্গে এমন অনেক ছোট ছোট বাড়ি ও খানার উল্লেখ করেছেন।

"জোড়াসাঁকোর ধারে" তে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন-"আর্টিস্ট হচ্ছে কলেক্টর, সে এটা ওটা থেকে সংগ্রহ করে সারাক্ষণ, সংগ্রহেই তার আনন্দ।" নিজের উক্তির সাথে কোথাও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছেন কলেক্টর অবন ঠাকুর। তাঁর জীবনের মন্ত্র ছিল- "যাকে রাখো, সেই রাখে।" অবন কন্যা সুরূপা দেবী লিখেছেন- "বাবার এক যাকে রাখ সেই রাখে'র বাক্স ছিল, তিনি বলতেন কোনো জিনিস ফেলা ঠিক না।"[২০] কোন জিনিসই অবনীন্দ্রনাথের কাছে তুচ্ছ ছিল না। ছোট খাটো, টুকরো টাকরা, ভাঙা, পুরনো অনাদরের জিনিস অবনীন্দ্রনাথের আদর থেকে বঞ্চিত হয়নি। স্বভাবতই তাঁর মত একজন কলেক্টর দ্বারকানাথের

স্মৃতিবিজড়িত মহার্ঘ্য জিনিস সংগ্রহের জন্য শিশুর মত করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।" দক্ষিণের বারান্দা"তে অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এমনই কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা থেকে দ্বারকানাথের স্মৃতিধন্য জিনিসের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের অমোঘ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'দক্ষিণের বারান্দা' তে লিখেছেন একদিন তারা ছোটরা জোড়াসাঁকোর গোলবাগানে খেলছিল। অবনীন্দ্রনাথ হেলানো বেঞ্চিতে বসেছিলেন। খেলা করতে করতে একজনের পকেট থেকে একটা জিনিস ঘাসে পড়ে যায়। যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই ছোট ছেলেটি তাড়াতাড়ি জিনিস টি পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। অবনীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। তিনি জিনিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দেখাল 'লাল এক টুকরো কাচ। ডিমের মতো।' অবনীন্দ্রনাথ বলেন -"কোথেকে পেলি?এ তো দ্বারকানাথের বাতিদানের টুকরো। কী চমৎকার ভেঙেছে দেখেছিস। যেন রক পক্ষীর ডিম।" [২১] মোহনলাল লিখেছেন - "এখনও আমি মাঝেমাঝে ভাবি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলোয়ারি কাচের ওই চমৎকার মোলায়েম টুকরোটা পাবার জন্যে দাদামশায়ের কি মনে মনে বিষম একটা লোভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল। ওই রকম আর একখানা যদি পেতেন তাঁর ডেস্কের খুপরির মধ্যে যত্নে তুলে রাখতেন সেই ভাঙা কাচের টুকরো।"[২২]

মোহনলাল আরেকটা ঘটনা শুনিয়েছেন। একতলার দোলনার বাগানের পশ্চিমদিকে কাছারি ঘরে একটা ঘর ছিল যাকে বলা হত 'ক্যাশঘর।' ক্যাশঘর কে তখন গুদাম ঘরের মতো ব্যবহার করা হত। মোহনলাল লিখেছেন-" তার মধ্যে আছে দ্বারকানাথের আমলের ডাইনিং রুম এর কিছু আসবাবপত্র, ঝাড়লণ্ঠন, কাচের আর চিনেমাটির বাসন ইত্যাদি।তালাবন্ধ পড়ে থাকে জিনিসগুলো-কেউ কোনদিন খোলেও না।"[২৩] ঠাকুরবাড়ির সরকারবাবু ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত একদিন বলল যে ক্যাশঘরে ভূত ঢুকেছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন-"ওরে চোর নয় তো? মাটির নীচে দ্বারকানাথের কিছু পোঁতা ছিল কি না,কে জানে? চোরেরা হয়তো খবর পেয়েছে। ভূতও হতে পারে, বলা যায় না। সে আমলের ডাকাত ভূত।"[২৪] ভূত না চোর - এই রহস্য উদঘাটনের জন্য সেই রাতে শোয়ার আগে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্যাশঘর বাবা! ওখানে কী আছে কিছুই বলা যায় না। দেখ কী বেরয়!"[২৫] শেষমেশ রহস্যের উন্মোচন হল। ক্যাশঘরের দরজার মধ্যে গিয়ে দেখা গেল

"দ্বারকানাথের কাচের বাসনের আলমারির পাল্লা ফাঁক করে এয়া বড় এক ইঁদুর তার লম্বা ল্যাজ মাটিতে লুটিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।"[২৬] দেশলাই জ্বালাতেই 'দ্বারকানাথের ডিনার সেট চকচক করে উঠল।' অবনীন্দ্রনাথের উক্তি লক্ষ্যনীয়-"এ কি যে সে জিনিস? দ্বারকানাথের প্লেট-আওয়াজ কী! বাড়িসুদ্ধ মানুষকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছে।" [২৭] অবনীন্দ্রনাথের হাল্কা ঢঙের কথার মধ্যে পাঠক গূঢ় তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত জিনিসের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা সহজেই প্রকাশ পায়। মোহনলাল লিখছেন পরেরদিন বাসনগুলো তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করা হল। তিন ভাই 'পূর্বপুরুষের সম্পত্তি' পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন এবার থেকে তাঁরা বাসনপত্রগুলো ক্যাশঘরে না রেখে ওনারা ব্যবহার করবেন।

ঠাকুরবাড়ি সবসময়ই নতুন হাওয়া গ্রহণ করার জন্য দরজা জানালা খুলে রাখত। স্বদেশি আন্দোলনের হাওয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকল। দোতলার লাইব্রেরি ঘরে স্বদেশীয়ানা কে আহ্বানের বোধন শুরু হল। ঝালর দেওয়া ভারী পর্দা, দেয়ালে টাঙানো বিলিতি ছবি আর বিদেশি ঢঙের আসবাবপত্র সরিয়ে দেওয়া হল। সর্বত্র স্বদেশীয়ানার ছোঁয়া - শিল্প, সাহিত্য, কলা ও যাপন শিল্পে। মোহনলাল সেই মুহূর্তকথার বিবরণ দিয়েছেন- "সে সময়ে দাদামশায় তাঁর যত কিছু অয়েলপেন্টিং সব এক জায়গায় জড়ো করে বউবাজারের পুরনো জিনিসের দোকানদারদের ডেকে বেচে দিয়েছিলেন। শুধু বেচেননি তেলের রং করা দ্বারকানাথের একখানা উপবিষ্ট মূর্তি।"[২৮] অবনীন্দ্রনাথ জানতেন ঠাকুরবাড়ির সবকিছুর সূচনা দ্বারকানাথের হাত ধরেই- তাঁর সময়েই জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মালাবদল হয়েছিল। সেই সন্ধিক্ষণের পুরোহিত, ভারতে আধুনিক যুগের সূচনাপুরুষ দ্বারকানাথের স্মৃতি কে তাই তিনি মুছতে চাননি।

দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত জিনিসের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সবচাইতে প্রিয় ছিল পেন্ডুলাম ঝোলানো ঘড়ি। এ ঘড়ি অবনীন্দ্রনাথের কাছে কোন যন্ত্র ছিল না, ছিল জীবন্ত ইতিহাস। কত ঘটনার সাক্ষী থেকে এই যন্ত্র পরিবারের প্রবীণ সদস্য হয়ে উঠেছে। জোড়াসাঁকো ছেড়ে বরাহনগরের গুপ্ত নিবাসে যাবার সময় তাই অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "দ্বারকানাথের ঘড়িটা নিয়ে যাস যত্ন করে। ভাল করে সাবধানে বসাস ওটাকে।ওটা জ্যান্ত ঘড়ি। চোখ আছে। সব দেখে, সব বোঝে আমাদের কী হচ্ছে না হচ্ছে।"[২৯] মোহনলাল লিখেছেন -"অসীম স্নেহ ছিল এই পেন্ডুলাম ঝোলানো

ঘড়িটার উপর।বলতেন, দু'একবার এমন হয়েছে, বাড়িতে যখন কেউ মারা গেছে ঘড়িটা সেই সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"[৩০] মোহনলালের কথার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের "জোড়াসাঁকোর ধারে" লেখাতে। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় আছে ওনাদের পরিবারের কেউ মারা গেলে ঘড়িটা থেমে যেত। অবনীন্দ্রনাথের পিতার প্রয়াণের সময় দ্বারকানাথের ঘড়িটা অদ্ভূত আচরণ করেছিল। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়- "দেয়ালে ঘড়িটি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় স্থির, বাবামশায়ের মৃত্যুর সময়টি তখনো ধরে রেখেছে।"[৩১] বরানগরের বাড়িতেও ঘড়িটির অনুরূপ আচরণের কথা অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন -" সেদিনও বন্ধ হয়ে গেল অলকের মা যেদিন চলে গেলেন ঠিক জায়গায় কাঁটার দাগ টেনে। অলকরা চাবি ঘোরায়, ঘড়ি চলে না। অলককে বললুম, 'ও ঘড়ি তোরা ছুঁস নে, তোদের হাতে বিগড়ে যাবে। আমার সঙ্গে ওর অনেক কালের ভাব। আমি জানি ওর হাড়হদ্দ; আমার কাছে দে দেখি নামিয়ে।"[৩২] ঘড়ি নির্জীব বস্তু তাই কথা বলতে পারে না। তবে সে তার নির্জীবতায় অনেক সজীব জিনিসের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন-"আমি তাতে হাত দেবামাত্র ঘড়ি নতুন করে আবার চলতে লাগল।" [৩৩] অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যেই প্রকারান্তরে এই ঘড়ির উল্লেখ করেছেন।পাঠকের মনে পড়বে তাঁর লেখা-" দাদাশ্বশুড়ের ঘড়ি" রচনার কথা যেখানে দাদাশ্বশুড়ের ঘড়ির মধ্যে দ্বারকানাথের ঘড়ির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। "দাদাশ্বশুড়ের আমলের পুরোনো ঘড়ি, ওর কি চোখ আছে না কান আছে?"[৩৪] আবার তিনি লিখেছেন-"ঘড়িটাতে তাহলে তোমার ভূতপূর্বার আত্মপুরুষ ঢুকেছে-ওটারে আর ঘরে রাখা নয়" [৩৫] এই সমস্ত সংলাপ পড়লে বোঝা যায় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ঘড়ির আত্মার যোগ। ঘড়ির মধ্যেই কি দ্বারকানাথ বারবার অবনীন্দ্রনাথের কাছে উঁকি দিয়েছেন? পাঁচ নম্বর বাড়িতে দ্বারকানাথের কোন স্মৃতিই অবনীন্দ্রনাথের চোখে এড়ায়নি। দ্বারকানাথের আমলের পুরনো টেবিল ও চেয়ার যেমন তিনি 'তোশাখানার পাশে উত্তর দিকে ভিন্ডিখানায় দেখেছেন', তেমনি মনে রেখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বাবুর কাছে 'ছেলেবেলায় দ্বারকানাথের আমলের জাহাজের মতো প্রকান্ড একটা কৌচে বসে' সন্ধ্যেবেলায় সেকালের কর্তাদের গল্প শোনার স্মৃতি, অসুখ বিসুখের সময় দ্বারকানাথের 'ফ্যামিলি ডাক্তার' বেলী সাহেবকে। ঠাকুর বাড়ির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূচনাকার ছিলেন দ্বারকানাথ। তাই ঠাকুর বাড়ির থিয়েটারের গোড়াপত্তন প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের চৌরঙ্গী থিয়েটারের কথা উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের মতো

দ্বারকানাথেরও সংবাদপত্র প্রকাশে ও পরিচালনায় বিশেষ উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথের পরামর্শ ও আর্থিক সহযোগিতায় একাধিক পত্র পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। অবনীন্দ্রনাথ বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে দ্বারকানাথের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা ভোলেননি।তাই নবজাগরণের অন্যতম হাতিয়ার সংবাদপত্রের প্রকাশে দ্বারকানাথের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন-"ইংলিশম্যান কাগজ দ্বারকানাথের আমলের, আগের নাম ছিল হরকরা, তিনিই বের করে গেছেন।" [৩৬] দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কে নিয়ে বহুল প্রচলিত একটি গল্পের অবতারণা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' তে। দেবেন্দ্রনাথ তখন খুব ব্যয় সংকোচে দিন কাটাচ্ছেন। জোড়াসাঁকোর নিম্নমুখিতা মিথ্যে মজা দেখার মানুষরা মাসে মাসে সভা ডেকে বসতেন যেখানে দেবেন্দ্রনাথ হয়তো আমন্ত্রিত সভাপতি বা প্রধান অভ্যাগত হিসেবে। এক সময় শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে এল নিমন্ত্রণ। সভায় সবার কৌতূহল দেবেন্দ্রনাথ কীভাবে নীল রক্তের গরিমা বজায় রাখেন তা নিয়ে। সাদা আচকান, সাদা মোড়াসা পাগড়ি পরে মহর্ষি একটা কোচে পা দুটি একটু বের করে বসলেন।সহসা লোকে দেখতে পেলেন দেবেন্দ্রনাথের মখমলের জুতোতে মুক্তো জ্বলজ্বল করছে। শোভাবাজারের রাজা যিনি দ্বারকানাথের বন্ধু তিনি ইশারা করে পারিষদদের বললেন, 'একেই বলে বড়োলোক। আমরা যা গলায়, মাথায় ঝুলিয়েছি -ইনি তা পায়ে রেখেছেন।"[৩৭] অবনীন্দ্রনাথ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লিখেছেন- " তখন কর্তাদাদামশায়দের বিষয়সম্পত্তির অবস্থা খারাপ-ঐ যে সময়ে তিনি পিতৃঋণের জন্য সবকিছু ছেড়ে দেন তার কিছুকাল পরের কথা।" [৩৮] অন্যান্যদের মতো অবনীন্দ্রনাথও দেবেন্দ্রনাথের পিতৃঋণ শোধের জন্য সবকিছু ছাড়ার কথা লিখলেও এখানে মনে রাখা উচিত দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ থেকে তাঁর সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। দ্বারকানাথ বিস্তর ঋণ রেখে গেলে দেবেন্দ্রনাথ জুতোতে মুক্তো লাগাতে পারতেন? দ্বারকানাথের শিল্প সাম্রাজ্য' কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'র পতনের জন্য দেবেন্দ্রনাথের দায় কোনভাবেই এড়ানো যায় না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টই লিখেছেন- "একটি বৃহৎ কারবার চালাইতে গেলে যে বুদ্ধি, যে দূরদর্শিতা এবং সর্ব্বোপরি যে সংযম আবশ্যক, সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তিন ভ্রাতার কেহই তাহার প্রাপ্ত হন নাই। পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন পক্ষে তাঁহারা তিনজনেই অসমর্থ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" [৩৯] অবনীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেও কেন এমন কথা লিখলেই

সেটাই আশ্চর্যের।

অবনীন্দ্রনাথের তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন -"সে সময়ে বাংলাদেশের যত জমিদার মিলে একটা সোসাইটি হয়, নাম ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন।"[৪০] দ্বারকানাথ ১৮৩৮ সালে ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৩৮ সালের ২১ শে মার্চ হিন্দু কলেজ গৃহে একটি সাধারণ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন রাধাকান্ত দেব। এই সভায় ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগ আইন সম্মতভাবে সরকারের সামনে উপস্থাপিত করার সর্বপ্রথম রাজনীতিক সংস্থা ছিল এই ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই সোসাইটি থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নেয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং এসোসিয়েশন থেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। জাতীয় জাগরণে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রপিতামহের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা এই অ্যাসোসিয়েশনের নামোল্লেখের মাধ্যমে স্মরণ করেছেন।

শিল্প ঐতিহাসিক কমল সরকারের মতে ' ব্রাস ক্লাবই সম্ভবত কলকাতা তথা বাংলার প্রথম শিল্পসংস্থা।' সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখেছেন কলকাতার প্রথম চারুকলা সংস্থা "স্থাপিত হয় ১৮৩০-৩১ সালে। দ্বারকানাথের সহযোগী, বন্ধু ও কার টেগোর কোম্পানির অংশীদার উইলিয়াম কার ছিলেন এই সংস্থার প্রথম সম্পাদক।" [৪১] দ্বারকানাথ বহু টাকা ব্যয় করে পশ্চিমি ভাস্কর্য চারুশিল্প কাচ পোর্সিলিন দ্রব্যের বিপুল সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বারকানাথের এই সংগ্রহের সঙ্গে কলকাতার প্রথম চারুকলা সংস্থা গড়ে ওঠারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সমকালীন চিত্রকলা আন্দোলনের ইতিহাসে কলকাতা শহরের আদিতম চিত্র প্রদর্শনীর প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩১ এর ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে। সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখেছেন -" টাউন হলে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর প্রথম দুই বছরে, কয়েকজন ভারতীয় সংগ্রাহকের বেশ কিছু ছবি ব্রাশ ক্লাব প্রদর্শন করেছিল। সংগ্রাহকদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম অগ্রগণ্য।" [৪২] ব্রাশ ক্লাবের একযুগ পরে জন্ম হয় ' সোসাইটি ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ ওরিয়েন্টাল পেন্টিং অ্যান্ড স্কাল্পচার।' তারপর এক এক করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি (১৮৮৯), 'দ্য জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি (১৮৯৭)। স্বদেশি আন্দোলনের সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৯০৫ সালে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় কলা সংসদ।' কিন্ত ব্রাশ ক্লাবের পর গঠিত শিল্পসংগঠনগুলি এককভাবে কেউই খুব উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যায়নি। শিল্পসংগঠনের দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমুখী সংগঠন হিসাবে 'ইন্ডিয়ান

সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট ' চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই সোসাইটি নির্মাণ এবং তার কর্মপ্রবাহ সচল রাখার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রূপ তাপস অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রপিতামহ দ্বারকানাথের সংগ্রহ দিয়ে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয়েছিল তা পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে অবনীন্দ্রনাথের উপযুক্ত কর্মোদ্যোগে।

"অবনের দুই অস্ত্র- রং আর কথা, আঁচড় আর আখর।"[৪৩] অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার মাধ্যমে আধুনিক ভারতশিল্পে প্রথম রেনেসাঁস আরম্ভ করেন, তিনি ছিলেন ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং নবযুগের প্রবর্তক। আধুনিক ভারতের শিল্প গুরুর ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা যায়- "ভারতের প্রাচীন শিল্পের মধ্যে যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে একথা আমরা যেদিন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, বিলিতি চিত্রকলায় যেদিন আমাদের চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সেইদিনই নতুন বিস্ময় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের আর্বিভাব।"[৪৪] রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করেছেন- " তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন।"[৪৫] অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় শিল্পেরই অঙ্কন পদ্ধতি শিখেছিলেন কিন্ত তাতে তার তৃপ্তি ছিল না। ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকালে অবনীন্দ্রনাথ প্রেরণা হিসেবে পেলেন দ্বারকানাথ কে। যখন ইউরোপীয় চিত্রাঙ্কনে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না,' খালি মনে হত - কিছু হলো না, কিছু আঁকতে পারলুম না। এই সময় একদিন হঠাৎ তিনি একখানা প্রাচীন পুঁথি পেয়ে গেলেন তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের গ্রন্থশালায়।" সুকুমার সেন লিখেছেন "তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বছর (১৮৯৮) তখন দৈবক্রমে তাঁহার হাতে আসে তাঁহাদেরই পৈতৃক সংগ্রহের একখানি গ্রন্থ যাহাতে মোঘল বাদশাহের আমলে আঁকা অনেক ছবি ছিল।"[৪৬] দ্বারকানাথের গ্রন্থশালায় সেই প্রাচীন পুঁথি ছিল মোঘলযুগের প্রাচীন চিত্রের পুঁথি। তারপরের ঘটনা মনোজিৎ বসুর বর্ণনানুসারেঃ " কত সূক্ষ কারুকার্যে ভরা সেই পুঁথির প্রতিটি চিত্রপট। অবনীন্দ্রনাথ দেখেন, আর বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ হয়ে যান। চোখের সামনে তিনি দেখতে পেলেন নতুন শিল্পজগৎ। ইউরোপীয় শিল্পের ছাত্রের চোখে সেদিন ধরা দিল ভারতীয় শিল্পের রূপ- মাধুর্য। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ মনের খোরাক খুঁজে পেলেন এতকাল পরে। আবার তিনি নতুন করে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।"[৪৭]

দ্বারকানাথের গ্রন্থশালা যেমন অবনীন্দ্রনাথের দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল তেমনি কোন্নগরে

দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত বাগানবাড়িও তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার সূচনালগ্নের সঙ্গে জড়িত ছিল। ২০০৭ সালের ২৮ শে মে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন অবনীন্দ্রনাথের কোন্নগর বাগানবাড়িকে হেরিটেজ ভবন হিসেবে ঘোষণা করে। কোন্নগর পৌরসভা থেকে প্রকাশিত ২০২০ সালের ১৪ মে স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণে স্মারকগ্রন্থ "কোন্নগরে অবন ঠাকুর" বইতে" সভাপতির কলমে" কোন্নগর পৌরসভার পৌরপ্রধান ও বইয়ের প্রকাশক বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী লিখেছেন-"জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের কেনা অজস্র জমিদারির একটি অংশ হিসেবে কোন্নগরের বাগানবাড়ি তাঁর মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়েছিল। আর গিরীন্দ্র-পরবর্তী যুগে তা এসে পড়েছিল পুত্র গুণেন্দ্রর অধিকারে।"[৪৮] কোন্নগরের এই বাগানবাড়িতেই 'ছবির রাজা'র গ্রামবাংলার চালচিত্রের সঙ্গে পরিচয়। ১৮৭৭-৭৮ এই সময়ে ৭ বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথ কোন্নগর বাগানবাড়িতে ছুটি কাটিয়েছিলেন। এখানেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী জীবনের হাতেখড়ি। প্রথম কুঁড়েঘর আঁকা শেখা এখানেই। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তে অবনীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি- "সেই সেবার কোন্নগরে আমি কুঁড়েঘর আঁকতে শিখি। তখন একটু -আধটু পেনসিল নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এটা-ওটা দাগি। বাগান থেকে দেখা যেত কয়েকটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের চালাটা যে গোল হয়ে নেমে এসেছে তা তখনি লক্ষ্য করি। এর আগে আঁকতুম কুঁড়েঘর-বিলিতি ড্রইং বইয়ে যেমন কুঁড়েঘর আঁকে। দাদাদের কাছে শিখেছিলুম এক সময়ে। বাংলাদেশের কুঁড়েঘর কেমন তা সেইবারই জানলুম, আর এ পর্যন্ত ভুল হল না।"[৪৯] শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্প জীবনের হাতেখড়ি দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে।

যাঁর স্মৃতি অবনীন্দ্রনাথের আত্ম উপলব্ধির দরজা খুলে দিল তিনি সেই দ্বারকানাথের ছবি কি এঁকেছিলেন? তিনি তো পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের অনেকের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। দ্বারকানাথ কি সেই তালিকায় ছিলেন? উত্তর হ্যাঁ ছিলেন। দ্বারকানাথ শিল্পীদের দিয়ে নিজের বা পরিচিতদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রাখতে ভালোবাসতেন।" শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে তাঁর হাতে লেখা যে চিরকুটের খাতা আছে, তা-থেকে দেখা যায় প্রায় একই সময়ে তিনি এই দুই শিল্পীর -স্যে ও শী-র স্টুডিয়োতে গিয়ে চিত্রকরদের সামনে বসে সীটিং দিয়েছেন।" [৫০] কৃষ্ণ কৃপালনীর লেখা থেকে এফ আর স্যে, স্যর মার্টিন আর্চার শী, বারোঁ দ্য শোয়াইতের ও কাউন্ট দ্যো'রসে-র আঁকা দ্বারকানাথের চারটি প্রতিকৃতির সন্ধান পাই। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর "চিত্রকথা"

বইতে অবনীন্দ্রনাথের তেল রঙে আঁকা দ্বারকানাথের একটি প্রতিকৃতির উল্লেখ করেছেন- 'Portrait of Dwarkanath Tagore- a copy in oil (coll. Pradyot Kumar Tagore). [৫১] অবনীন্দ্রনাথ কোন বিদেশি শিল্পীর আঁকা দ্বারকানাথের প্রতিকৃতি দেখে এঁকেছিলেন তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাদশা) লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্প জীবনের প্রথমদিকে 'পামার ও গিলার্ডির কাছে অঙ্কনপদ্ধতি শিক্ষার পর ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তেল রঙে নানা ছবি এঁকে তখন হাত মকসো করছেন। এ সময় বাড়ির লোকেদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের তর্ক শুরু হয়। সবাই বলেন যে ওয়েল পোর্ট্রেট আঁকার পদ্ধতি তিনি রপ্ত করতে পারেননি। সুমিতেন্দ্রনাথ লিখেছেন -"এই সময় আমাদের পাঁচ নম্বরের দোতলার নাচঘরে ঝুলত এক বিদেশির আঁকা দ্বারকানাথের এক অয়েল পেন্টিং। ঠিক হল, ঐ অয়েল পেন্টিং এর কপি যদি তিনি করতে পারেন তবেই তাঁরা ধরে নেবেন যে অবনীন্দ্রনাথ অয়েলে পোর্ট্রেট করতে পারদর্শী।"[৫২] সুমিতেন্দ্রনাথ তারপর বর্ণনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ কীভাবে দেওয়াল থেকে দ্বারকানাথের পোর্ট্রেট নামিয়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে বিদেশী শিল্পীর আঁকা পোর্ট্রেটের কপি করলেন। বিদেশি শিল্পীর আঁকা আর নিজের আঁকা দ্বারকানাথের পোর্ট্রেট যখন দেখালেন তখন সকলেই বিস্মিত হলেন। সুমিতেন্দ্রনাথ বলছেন- " যাঁরা দাদামশায়ের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন তাঁরা মুখ চুন করে মাথা নামালেন। আর দাদামশায় কপি করা ছবিটার বাঁ পাশে তলায় A .Tagore সই করে দেন।" [৫৩] সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা দ্বারকানাথের পোর্ট্রেট টা মুকুল দে কে সংস্কার করতে দেন। মুকুল দে সেটার সংস্কার করে দিলে পোর্ট্রেটটা বরানগরের গুপ্তনিবাসে বহুদিন ছিল। গুপ্ত নিবাস ছাড়ার সময় সেই পোর্ট্রেট টি অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেনকা ঠাকুর কে দান করে যা তখন ছ'নম্বর বাড়ির ' অবনীন্দ্র কক্ষ' এ সংরক্ষিত ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন যে " তাঁর দাদামশায় শোয়াইতের এর মূল প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন তেলরঙে। অবনীন্দ্রনাথের পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি সমর্থন করে বলেছেন- " পিতামহ শোয়াইতের কৃত উপবিষ্ট দ্বারকানাথের প্রতিকৃতির যে প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন আমরা যখন গুপ্তনিবাস ছেড়ে চলে যাই তখন সেই প্রতিলিপি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার পিতা (অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তখন সেই

ছবিটি ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথকে দেন। আমরা যখন জোড়াসাঁকোয় থাকতাম পিতামহের আঁকা প্রতিলিপিটি থাকত দোতলার হল ঘরে আর শোয়াইতের এর মূল ছবিটি থাকত তেতলায়।" [৫৪] আবার অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র মানীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন- "প্রিন্স দ্বারকানাথের মস্ত বড়ো একটা ছবি আঁকতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ল্যাম্বাগো প্রবলেম হয়।" [৫৫] তারপর অবনীন্দ্রনাথ শুরু করেন মিনিয়েচার পেন্টিং।

অবনীন্দ্রনাথের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রর স্মৃতিচারণায় যথেষ্ট গরমিল। তবে সবার বক্তব্য থেকে একটা জিনিস পরিস্কার যে অবনীন্দ্রনাথ বিদেশি কোন চিত্রকরের আঁকা দ্বারকানাথের প্রতিকৃতির কপি করেছিলেন। এই বিষয়ে আমরা ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য দেখে নেবো। ক্ষিতীন্দ্রনাথের দৌহিত্র ছাড়া অমৃতময়ের আরেকটা জনপ্রিয় পরিচয় হল যে তিনি 'সমকালীন' পত্রিকায় দ্বারকানাথের বহুবিধ দিক নিয়ে ২৪ টি প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের এর পৌষ সংখ্যায় লিখেছেন- "ছেলেবেলা থেকে দেখছি দোতলার বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে দ্বারকানাথের একটা মস্ত ছবি। এতবার দেখেছি যে এখনও যে কোন সময় চোখ বুজলেই দেখতে পাই- মাঝারি মাপের লোক। মাথায় বাবড়ি চুলের উপর সামলার মত বাঙালী পাগড়ি। পরণে মখমলের উপর কাজ করা জোব্বা আর কাশ্মীরি জামেয়ার তার উপর। হাতের আঙুলগুলো মেয়েদের মত সরু সরু , পাকানো গোঁফ জোড়ার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান।পাশে পাথরের টেবিলের উপর সূক্ষ কাজ করা এক আলবোলা, তারই একটা অংশে দোয়াত কলম দান।টেবিলের পাশে তলায় বইয়ের গাঁদা।" [৫৬] অমৃতময় শিল্পীর নাম উল্লেখ করেননি।কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন- এটি " এনা দেবী বর্ণিত শোয়াইতের অংকিত প্রতিকৃতি নাও হতে পারে।"[৫৭] বরং কৃপালনীর মতে, "এ বর্ণনা বরঞ্চ স্যে-র আঁকা প্রতিকৃতির সঙ্গে বেশি মেলে।"[৫৮]

দ্বারকানাথের সাথে সংযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের আরেকটা উল্লেখযোগ্য ছবির নাম করা যেতে পারে। ছবির নাম- "হাঞ্চব্যাক অব দি ফিসবোন।" ছবিটি আঁকার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শিল্প সমালোচক মৃণাল ঘোষের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-"১৯৩০ সালে অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন আরব্য রজনী চিত্রমালা।অনেকের মতে এবং তাঁর নিজের মতেও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপচার।' জোড়াসাঁকোর ধারে'র স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'এই ধরে দিয়ে

গেলুম। আমার জীবনের সবকিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।' একদিকে আরবের কাহিনি, আরবের মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডল, আর একদিকে তাঁর সমসাময়িক দেশ-কাল, ঔপনিবেশিক অস্তিত্বের নানা জটিলতা- এই দুইয়ের মধ্যে এক তীর্যক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তিনি এই চিত্রমালায়।"[৫৯] মৃণাল ঘোষের মতে 'এই দান্দ্বিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ' হাঞ্চব্যাক অব দি ফিসবোন' ছবিটি। এতে দুই যুগের দুটি আখ্যান একত্রিত হয়েছে। ছবিটিতে আমাদের দেশীয় অনুচিত্রের পরিপ্রেক্ষিত -বিন্যাসরীতি ব্যবহার করেছেন শিল্পী অসামান্য বিদগ্ধতায়। বামপাশে নিম্নবর্তী অংশে রূপায়িত হয়েছে আরব্য রজনীর আখ্যান। এক দরজি ও তার পত্নী এক বিদেশি কুটুম্ব ভোজনে আখ্যায়িত করতে গিয়ে রসিকতা করে খাদ্যের মধ্যে মাছের কাঁটা মিশিয়ে দিয়েছে। সেই কাঁটা গলায় আটকে মরণাপন্ন সেই অতিথি। ডানপাশে ওপরের দিকে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'র সাইনবোর্ড। ওপরে এক প্রকোষ্ঠে বিদেশি এক অতিথিকে আপ্যায়নের দৃশ্য। অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে স্থাপন করেছেন দ্বারকানাথের জায়গায়।" [৬০] ছবির ওপরে প্রকোষ্ঠে বিদেশি কে আপ্যায়নের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে টানা পাখা। ' অবন ঠাকুরের কথা' গ্রন্থের রচয়িতা ডাঃ সোমা সেন এই ছবি প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কে বলেছেন- " হাঞ্চব্যাক অ্যান্ড দ্য ফিস বোন ছবিতে দেখা যাচ্ছে টানা পাখার আড়ালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছবির আভাস। বাড়ির গঠনে ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ ধরণ। ঠাকুর বাড়ির তিন প্রজন্মের সব আরাম ও বিলাসিতার আড়ালে দ্বারকানাথের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করায়।"ছবি নিজে নড়ে না কিন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা প্রতীকী ছবি এখানেই সার্থক এবং তা কালোত্তীর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের কম বেশি অনেক ছবিতেই বাড়ির মাথায় আলো দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ির মাথার ওপরে এই আলো আসলে ঠাকুর বাড়ির মাথার ওপর দ্বারকানাথের দীপ্তিরই প্রকাশ।

দ্বারকানাথের পরবর্তী নক্ষত্রশোভিত বংশধরদের মধ্যে গুণেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের বংশধর ছাড়া তাঁকে ক'জন মনে রেখেছেন! কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন "সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর পৌত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র দুইজন, শিল্পী ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ, অনাগ্রহী ছিলেন না। আজ যদি দ্বারকানাথের ব্যক্তি সত্তা ও জীবন সম্পর্কিত কোনো স্মারণিক সামগ্রী রক্ষা পেয়ে থাকে, পেয়েছে এঁদের যত্নে। আজ তাই দ্বারকানাথের ব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু কিছু জিনিস

এখনো দেখতে পাওয়া যায় কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এ, ও রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় এবং শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে।"[৬১] রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ও শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত জিনিসের পূর্ণাঙ্গ তালিকা কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর লেখা "দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ" বইয়ের শেষে তালিকা দিয়েছেন। তবে সেই তালিকায় কোন কোন জিনিস গগনেন্দ্রনাথ ও কোন কোন জিনিস অবনীন্দ্রনাথের সৌজন্যে সংরক্ষিত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। তবে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনের দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত যে তালিকা কৃপালনী দিয়েছেন সেই তালিকার ১৩ নং আইটেমে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফ্যানি অঙ্কিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে লেখা সি. লুই পামার এর লেখা একটি চিঠি। দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রায় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নগেন্দ্রনাথ কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্যানি স্মিথ নামে এক তরুণ সুন্দরী নগেন্দ্রনাথের প্রেমে পড়েছিলেন। ১৮৪৬ সালে দ্বারকানাথের একটি প্রতিকৃতি স্বহস্তে এঁকে ফ্যানি উপহার দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথকে। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর ১৮৭৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবনীন্দ্রনাথ প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর ইংরেজ গুরু লুই পামারের একটি চিঠি পান। সেই চিঠিতে পামার লেখেনঃ " এই মহিলা একজন এমেচর আর্টিস্ট, বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তাঁর ছেলে নগেন্দ্রনাথকে দেবার জন্য।"[৬২] অবনীন্দ্রনাথ এই চিঠি তাঁর কাছে সযত্নে রেখেছিলেন বলেই এখন তা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে আছে।

অবনীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের কোন কোন স্মৃতিবিজড়িত জিনিস সংরক্ষণ করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও একথা সহজেই বলা যায় দ্বারকানাথ অবনীন্দ্রনাথের মনের সংগ্রহশালায় সবসময়ই মহার্ঘ্য জিনিস হিসেবে সুরক্ষিত থেকেছেন। অবনীন্দ্রনাথ গর্ভনমেন্ট আর্ট স্কুলে ১৯০৫ সালে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ কিন্ত প্রথমে সেই আর্ট স্কুলের বাঁধাধরা কাজের মধ্যে যেতে রাজি হননি। তাছাড়া, মায়ের অনুমতি না পেলে তিনি চাকরি করবেন না, এটা ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। সাহেব কিন্ত নাছোড়বান্দা। তিনি অবনীন্দ্রনাথের মায়ের কাছে অনুমতি চেয়ে ওনাকে রাজি করান। অগত্যা অবনীন্দ্রনাথ কে রাজি হতেই হয়। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কে এই চাকরির জন্য নিয়ম মাফিক একটি দরখাস্তও করতে হয়েছিল। দরখাস্তের খসড়া করে দিয়েছিলেন স্বয়ং হ্যাভেল সাহেব। দরখাস্তে অবনীন্দ্রনাথ নিজের যোগ্যতা ও শিল্পী হিসেবে কৃতিত্বের উল্লেখ

করে একেবারে শেষে লিখেছেন- "The fact of my being a great grandson of late Dwarka Nath Tagore will I trust be sufficient to indicate my general respectability and position in society." [৬৩] বিখ্যাত পরিবারের সন্তান হলে বা পিছনের পর্দা উজ্জ্বল হলে সর্বত্র কমবেশি তার আলাদা সুযোগ সুবিধা থাকে। ঠাকুরবাড়ি থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের প্রথম আই সি এস ও প্রথম নোবেলজয়ী কবি। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন তাঁদের এই সাফল্যের অনেক বছর আগে দ্বারকানাথ বিদেশে তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর রেখে বিদেশিদের কাছে 'প্রিন্স' হয়ে উঠেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের এই সাফল্যের পিছনে দ্বারকানাথের প্রভাব কি অস্বীকার করা যাবে? পৌত্রদের সাফল্যের পিছনে প্রিন্সের ম্যাজিক কি অনুঘটকের কাজ করেনি? সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরীক্ষক ছিলেন ম্যাক্সমুলার যিনি দ্বারকানাথের সাথে হৃদ্যতার কথা তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ 'Auld Lang Syne এর দ্বিতীয় খণ্ড "My Indian Friends" অংশে উল্লেখ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথও পিতামহের কথা ও ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দ্বারকানাথের কথোপকথনের কথা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ পিতামহ সম্পর্কে নীরব। পিতামহ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এক্ষেত্রে 'যাকে রাখো, সেই রাখে' এর পূজারী অবনীন্দ্রনাথ সসম্মানে দ্বারকানাথ কে রেখেছেন ও তাঁর প্রভাব কে প্রকাশ্যে মেনে নিয়েছেন। তিনি দ্বারকানাথ কে রেখেছেন কারণ তিনি জানতেন তাঁদের মতো যাঁরা দ্বারকানাথের উত্তরপ্রজন্ম দ্বারকানাথ তাঁদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও চাপান উতোর হীন জীবনের জন্য সমস্ত উপাদান রেখে গিয়েছেন।

দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের সময়ই ১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট প্রয়াণ ঘটে। তাঁকে কেনসল গ্রীনে সমাধিস্থ করা হয়। দ্বারকানাথ তাঁর ' গুরু' ও অসমবয়সী বন্ধু রামমোহনের ব্রিস্টলের সমাধির সংস্কার করে সুরম্য একটি স্মৃতিসৌধ রচনা করেছিলেন। অথচ তাঁর নিজের সমাধি চরম অযত্ন, অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোমোহন ঘোষ যিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেতে গিয়েছিলেন আই সি এস পরীক্ষায় বসতে, তিনি দ্বারকানাথের সমাধির দুরবস্থা দেখে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ১৮৬২ সালের ১৭ মে একটি চিঠিতে লেখেন- "যে মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বিলেতে এসেছি, বিলেতে আসতে পারার জন্য একমাত্র যাঁর কাছে আমরা ঋণী,

তিনি একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কবরে শুয়ে আছেন, অথচ যারা তার চাটুকর সভাসদ মাত্র ছিল-তারা দিব্য মার্বল পাথরে তৈরি সমাধিতে শয়ান এবং তাদের সমাধিপ্রস্তরে কত প্রশংসাসূচক বাগবিস্তার। আমি শুনেছি আপনার জ্যেঠামশায়কে (মহর্ষি) হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছিল ওই কবরটার জন্য। খোঁজ নিয়ে জানলাম খরচ হয়েছে বড়জোর দুই পাউন্ড অথাৎ কুড়ি টাকা। বিলেতের সারা তল্লাটে এই রকম কদাকার সমাধি কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।"[৬৪] দ্বারকানাথের স্মৃতিরক্ষায় আগ্রহী গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের সমাধি রক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রপিতামহের চিঠিপত্র ও অন্যান্য স্মারক দ্রব্য সংরক্ষণে আগ্রহী ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথের এই চিঠিপত্রের মধ্যে ছিল কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রের সুপারিন্টেন্ডেট টি বার্গেস এর লেখা চিঠি। চিঠিতে তিনি লেখেন- "সমাধি নং ৬২৪৭ 'ঠাকুর' এর অবস্থা খুবই শোচনীয়। পাথরের খুঁটিগুলি চারপাশে একেবারে বসে গেছে। শিকলগুলি জং ধরে একপ্রকার নষ্ট হবার দাখিল। ভালো করে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন করা, খোদাই করা লিপিতে কালো রং লাগানো, পাথরের খুঁটি উঠিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, শিকলগুলি ঘষে মেজে দু-কোট রং দেওয়া -এইসব কিছু মিলে খরচ পড়বে ৪ পাউন্ড ১৫ শিলিং। তাহলে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে।" [৬৫] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর টাকা পাঠিয়েছিলেন " কারণ ১৯০৬ অব্দের ১৭ এপ্রিল তারিখে মিঃ বার্গেস চেক - এর প্রাপ্তি স্বীকার করে জানালেন যে আবশ্যকীয় মেরামতিকার্য সুসম্পন্ন হবে।" [৬৬] দ্বারকানাথের সমাধি রক্ষার্থে গগনেন্দ্রনাথের এই উদ্যোগ তাঁর একক প্রচেষ্টা ছিল না, গগনেন্দ্রনাথের বাকি দুই অভিন্ন হৃদয় সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। অবনীন্দ্রনাথের রচনা, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, আঁকা ও মুদ্রিত ছবির মধ্যে এখনও অনেকাংশই অপ্রকাশিত। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকা অবনীন্দ্রনাথের সেই সমস্ত অপ্রকাশিত লেখা ও রেখায় দ্বারকানাথ চর্চার রসদ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ভবিষ্যতে কোন গবেষক যদি সেই অপ্রকাশিত সিন্দুক খুলতে পারেন তবেই 'রূপকথার নায়ক' থেকে রক্ত মাংসের দ্বারকানাথ কে আমরা খুঁজে পাবো।

উপসংহারে আসার আগে একটি অপ্রিয় সত্য ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করাটা বোধহয় জরুরি। বিষয় টি হল রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথের কাগজপত্র পোড়ানো।বাংলা ভাষায় দ্বারকানাথের প্রথম জীবনীকার তথা দ্বারকানাথের উত্তরপুরুষ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর

"দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী" গ্রন্থে লিখেছেন -

> এই কুঠীর কারবার দ্বারকানাথের জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বে এবং তাহার আদেশে দগ্ধীভূত হওয়া তে এই কারবার যে কত বিস্তৃত ছিল এবং কিরূপে পরিচালিত হইত, তাহার বিবরণ উদ্ধার করিবার কোন আশা নাই। [৬৭]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ১৩৭০ এর 'সমকালীন' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় লেখেন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দ্বারকানাথের কাগজপত্র পোড়ানোর বিস্তারিত বিবরণ - "কার- ঠাকুর কোম্পানী নিলামে চড়ার পর আফিস যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে উঠে আসে তখন সমস্ত কাগজপত্র দ্বারকানাথের বসতবাড়ীর (বর্ত্তমান মহর্ষি ভবনের) নীচের তলায় জড়ো করিয়া কয়েকটা ঘরে বন্ধ রাখা হয়।তার প্রায় ত্রিশ - চল্লিশ বৎসর বাদে যখন ঠাকুরবাড়ীতে সাহিত্যের হাওয়া জোর বইছে এবং নিত্যনূতন আসর বৈঠকের জন্য স্থানাভাব হচ্ছে সেই সময়ে ঐ সব কাগজ স্তূপীকৃত করে পিছনের (পূর্ব্বদিকের) বাগানে রবীন্দ্রনাথের আদেশে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ভস্মীভূত করা হয়।" রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের কাগজপত্র পুড়িয়েছিলেন, এ কথা বলে, সুভো ঠাকুর তাঁর 'বিস্মৃতিচারনা' (শারদীয় দেশ, ১৩৯১) তে লিখেছেন- কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর বইয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথের কথারই প্রতিধ্বনি সহকারে আফসোস করেছেন। সুভো ঠাকুর উল্লেখিত 'ক্ষিতীন্দ্রনাথের কথা' যা প্রথমেই উদ্ধৃত করা হয়েছে তার উৎস হল জোড়াসাঁকোয় ' রবীন্দ্রভারতী' প্রদর্শশালা'র সংরক্ষণ ঘরে বা ' দস্তাবেজখানা'য় ক্ষিতীন্দ্রনাথ পুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত একটি প্যাডের কাগজ ।সেই প্যাডের কাগজে লেখা আছে - "ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ গল্প করলেন যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের business letters এর copy শুদ্ধ তিন Volume খাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বা না ঠার কাগজ প্রভৃতি পুড়াইবার সময় Sir Ashu Chowdhury কে দেখতে দিয়াছিলেন।তাঁর কাছ থেকে ৺ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এনেছিলেন।তারপর কোথায় গেছে জানেন না।" [৬৮] রবীন্দ্রনাথ জীবনীকারগণ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত কুমার পাল এনারা কেউই ক্ষিতীন্দ্রনাথ কর্তৃক লেখা এই রকম একটি মারাত্মক মন্তব্যের প্রতিবাদ করেননি- তাঁরা স্বীকার করেননি , অস্বীকারও করেননি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভো ঠাকুর ও অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই মন্তব্যের উৎস অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'রবি কাকা'র যেমন সৃজনশীল দিক তুলে ধরেছেন,

তেমনি তিনি পারিবারিক মহলে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত, অজানিত ঘটনা বা গল্পের উল্লেখও করতেন, যে গল্পে চিরাচরিত রবি'র নিচে কালো মেঘের ছটাও দেখা যেত।"

ভারতের নবজাগৃতিতে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিল যে পরিবার সেই পরিবারের 'রবি' নিজের 'আত্মপরিচয়' তে লিখছেন- "আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।- নিরালয় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা- জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।"[৬৯] একটা পরিবার সমগ্র সমাজ কে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় পৌঁছে দেবার যে মহাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন তার পুরোহিত ছিলেন দ্বারকানাথ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯০২ সালে অবনীন্দ্রনাথ আঁকেন 'বঙ্গমাতা' র ছবি যা ১৯০৫ এ স্বাদেশিকতার বাতাবরণে 'ভারতমাতা'য় উর্ত্তীর্ণ হয়। এই ছবির মধ্যে দেশকে মাতৃরূপ দেওয়া হয়েছে। দেশকে মা রূপে কল্পনা- জাতীয়তাবাদের এই ধারণা যা অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে ফুটে উঠেছে তা দ্বারকানাথের কর্মকাণ্ড ও চিন্তাভান্ডের মাধ্যমেই ঠাকুর বাড়ির ইতিহাসে প্রথম যোজিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের জন্মের অনেক বছর আগে তাঁর প্রপিতামহ তাঁর সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে ভারতমাতার পায়ে পুজো দিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক গোলামি আর মুৎসুদ্দী বৃত্তির বাইরে গিয়ে ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্য কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্বারকানাথ স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের সূচনা করে শিল্প বাণিজ্যে ভারতীয়করণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে ভারতীয় চিত্রকলাকে উদ্ধার করে নিজস্ব ঐতিহ্যের শেকড় যুক্ত করে আধুনিকতা উন্মীলনের স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেছিলেন। রুদ্ধ গুহাগৃহ থেকে উৎসারিত নদীর মহাসমুদ্রে মিলনেই সকল সার্থকতা। অবনীন্দ্রনাথও জোড়াসাঁকোর অন্দরে দ্বারকানাথ কর্তৃক সূচিত সদা বহমান স্বাদেশিকতার ফল্গুধারাকে 'ভারতমাতা' রূপ দিয়ে জাতীয়তাবাদের মহাসমুদ্রে মিলিয়ে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি- পূর্ব থেকে পশ্চিম', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দি জেনারেল বুকস, শুভ মহালয়া, ১৪১০, পৃ- ১
২। কৃষ্ণ কৃপালনী, "দ্বারকানাথ ঠাকুর - বিস্মৃত পথিকৃৎ" (অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়), ষষ্ঠ পুনমুর্দ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,২০১৭,

পৃ- ix (ভূমিকা)।
৩। অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের লেখা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রঞ্জিনী দাশগুপ্তের সৌজন্যে।
৪। অমৃতময় মুখোপাধ্যায়, "ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা",সমকালীন, পৌষ, ১৩৬৫, পৃ-৫৪৩।
৫। তদেব, পৃ- ৫৪৩।
৬। তদেব, পৃ-৫৪৩।
৭। চিত্রা দেব, "ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল", প্রথম সংস্করণ,কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ২০১৬, পৃ- ৯৬।
৮। অবনীন্দ্রনাথ রানীচন্দ, "জোড়াসাঁকোর ধারে",কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ, ১৪১৮ , পৃ- ৮২।
৯। "অবনীন্দ্রনাথ", মনোজিৎ বসু, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫২, পৃ- ২৯।
১০। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আপনকথা" , সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০১২, পৃ- ৪৮।
১১। তদেব, পৃ- ৪৮।
১২। তদেব, পৃ-৪৮-৪৯।
১৩। তদেব, পৃ- ৫১।
১৪। তদেব, পৃ- ৪৯-৫১।
১৫। ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, "নান্দনিক স্পর্শে লেখায় ও রেখায় ওবিন ঠাকুর", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, সাগ্নিক বুকস, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ-৪।
১৬। জসীমুদ্দিন, "ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বলাকা, জানুয়ারি ২০০৭,পৃ- ৪৪।
১৭। অবনীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃ- ৩।
১৮। অবনীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, পৃ-৩৫৭।
১৯।অবনীন্দ্রনাথ রাণীচন্দ, "জোড়াসাঁকোর ধারে", কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ- ১০৯।
২০। সুরূপা দেবী, "বাবার কথা", পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত "স্মৃতিকথায় জোড়াসাঁকো", দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ-১২০।
২১। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, "দক্ষিণের বারান্দা", প্রথম সিগনেট

সংস্করণ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ-৫।
২২। তদেব, পৃ- ৫।
২৩। তদেব, পৃ- ১৩৪।
২৪। তদেব, পৃ- ১৩৪।
২৫। তদেব, পৃ- ১৩৬।
২৬। তদেব, পৃ- ১৩৮।
২৭। তদেব, পৃ - ১৩৮।
২৮। তদেব, পৃ- ১৮৫।
২৯। তদেব, পৃ- ২০৯।
৩০। তদেব, পৃ- ২০৯।
৩১। অবনীন্দ্রনাথ রানীচন্দ, "জোড়াসাঁকোর ধারে" ,কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ- ৬১।
৩২। তদেব, পৃ- ৬১।
৩৩। তদেব, পৃ-৬১।
৩৪। অবনীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, পৃ- ৩৬৫।
৩৫। তদেব, পৃ-৩৬৭।
৩৬। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাণীচন্দ, "ঘরোয়া", কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ- ১২৮।
৩৭। তদেব,পৃ- ৪৮।
৩৮। তদেব, পৃ-৪৭।
৩৯। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী", প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অফবিট পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ- ৮০।
৪০। অবনীন্দ্রনাথ রাণীচন্দ, "জোড়াসাঁকোর ধারে" কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ- ১১৭।
৪১। কৌশিক মজুমদার ও সৌম্যেন পাল সম্পাদিত, "সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ-২" , পুনমুর্দ্রণ, কলকাতা,বুকফার্ম, নভেম্বর ২০১৯, পৃ- ২৯৪।
৪২। তদেব, পৃ- ২৯৪।
৪৩। জসীমুদ্দিন, "ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়" , প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বলাকা, জানুয়ারি ২০০৭,পৃ- ৪৮।
৪৪। "অবনীন্দ্রনাথ", মনোজিৎ বসু, প্রথম প্রকাশ , কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫২, পৃ- ১২।

৪৫। 'ঘরোয়া' র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রানীচন্দ, - "ঘরোয়া", কলকাতা , বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ভাদ্র ১৪১৭।
৪৬। সুকুমার সেন, "অবনীন্দ্রনাথ ও আর্টের প্রভাব",'পশ্চিমবঙ্গ' অবনীন্দ্র সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০২ , পৃ- ৭৩।
৪৭। অবনীন্দ্রনাথ", মনোজিৎ বসু, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫২, পৃ- ১৫-১৬।
৪৮। "কোন্নগরে অবন ঠাকুর", স্মৃতি সৌধ সংরক্ষণে স্মারকগ্রন্থ, কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্পপ্রদর্শনী কমিটি কোন্নগর পৌরসভা।
৪৯। অবনীন্দ্রনাথ রানীচন্দ, "জোড়াসাঁকোর ধারে", কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ, ১৪১৮ , পৃ- ৩৭।
৫০। কৃষ্ণ কৃপালনী, "দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিস্মৃত পথিকৃৎ" (অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়), ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,২০১৭, পৃ- ২৮৭।
৫১। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'চিত্রকথা", কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ- ৩৬৭।
৫২। সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, " ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা", পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ- ৪৩
৫৩। তদেব, পৃ- ৪৩-৪৪।
৫৪। কৃষ্ণ কৃপালনী, "দ্বারকানাথ ঠাকুর-বিস্মৃত পথিকৃৎ" (অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়), ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,২০১৭, পৃ- ২৮৯।
৫৫। মানীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "এই বাড়িটা নিশ্চয় জোড়াসাঁকোর মত ভেঙে ফেলবে না ওরা", বৈশাখী অবনীন্দ্র সংখ্যা, ২২ সংখ্যা ২০১২- ১৩, পৃ- ১৮৫।
৫৬। অমৃতময় মুখোপাধ্যায়, "ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা", 'সমকালীন', পৌষ ১৩৬৫, পৃ- ৫৪৩।
৫৭। কৃষ্ণ কৃপালনী, "দ্বারকানাথ ঠাকুর-বিস্মৃত পথিকৃৎ" (অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়), ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৭, পৃ- ২৯০।
৫৮। তদেব, পৃ- ২৯০।
৫৯। মৃণাল ঘোষ, "শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ", "অবন ঠাকুর ১৫০", নতুন কৃত্তিবাস, এপ্রিল ২০১৯ , পৃ- ১১।
৬০। তদেব, পৃ- ১১।

৬১। কৃষ্ণ কৃপালনী, "দ্বারকানাথ ঠাকুর-বিস্মৃত পথিকৃৎ" (অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়), ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৭, পৃ- ২৭৭।
৬২। তদেব পৃ- ২৯২।
৬৩। সোমা সেন, "অবন ঠাকুরের কথা" ,প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি, আগস্ট ২০১১ (শ্রাবণ ১৪১৮), পৃ- ২৬।
৬৪। কৃষ্ণ কৃপালনী, "দ্বারকানাথ ঠাকুর-বিস্মৃত পথিকৃৎ" (অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়), ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,২০১৭, পৃ- ২৮০।
৬৫। তদেব, পৃ- ২৮২।
৬৬। তদেব, পৃ- ২৮২।
৬৭। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী', কলকাতা, অফবিট পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ- ৬৫।
৬৮। গোপালচন্দ্র রায়, "রবীন্দ্র-বিতর্ক, কলকাতা", পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র, ১৯৪, পৃ- ১০।
৬৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মপরিচয়" ,কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,আশ্বিন ১৪১৭, পৃ- ৭৭-৭৮

ব্যক্তিঋণ - ডাঃ সোমা সেন।